ইসলামী শিক্ষার আলোকে

প্রকৃত শান্তি

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক ২১শে আগস্ট ২০২২ তারিখে জলসা সালানা জার্মানির সমাপনী অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা

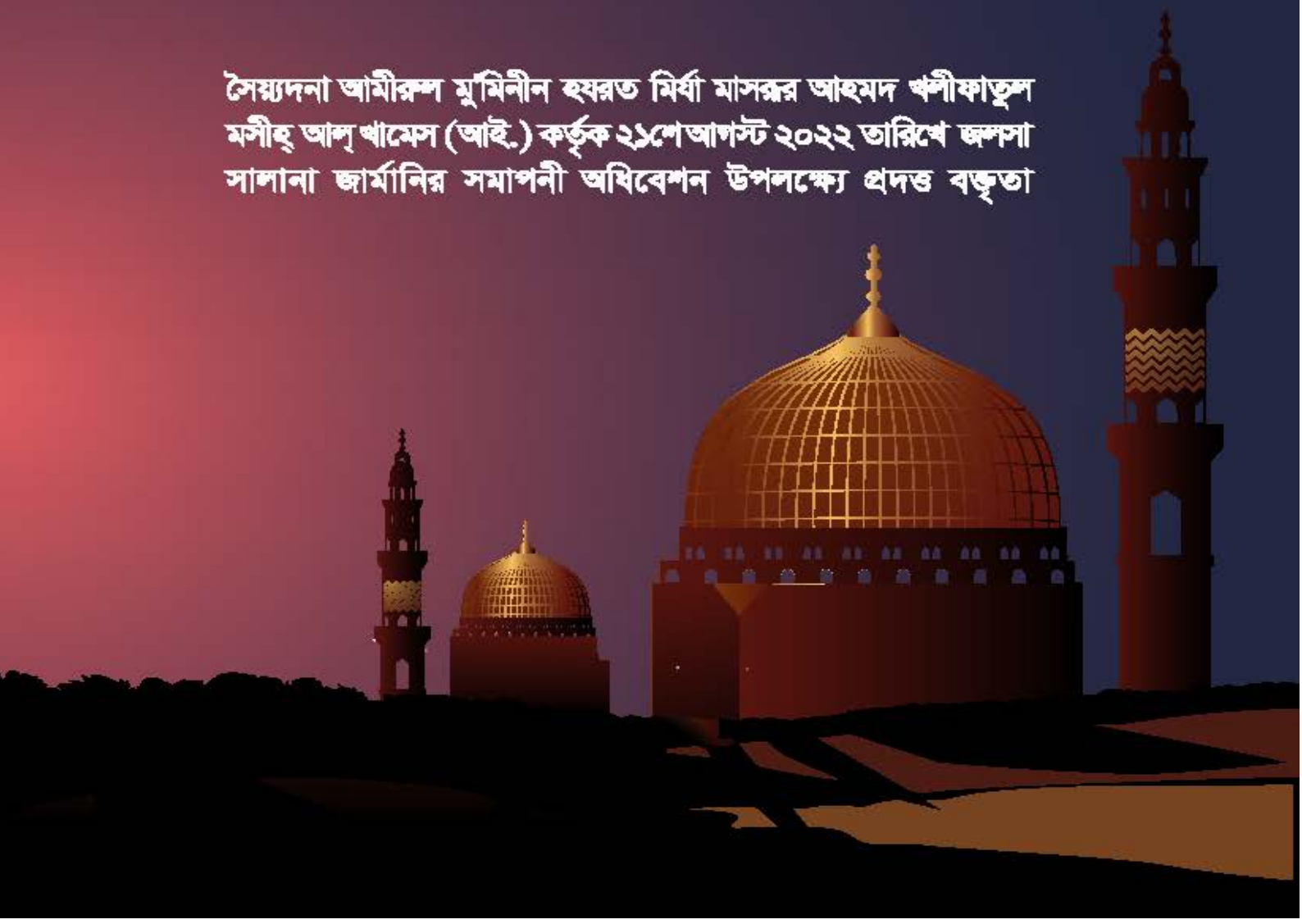

ইসলামী শিক্ষার আলোকে
প্রকৃত শান্তি

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রকৃত শান্তি

লেখকের নাম	: হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)
ভাষান্তর	: জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান
সংস্করণ	: প্রথম সংস্করণ (বাংলা) ডিসেম্বর ২০২৩
সংখ্যা	: ৫০০
প্রকাশক	: নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব-১৪৩৫১৬
মূদ্রণ	: ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব- ১৪৩৫১৬

Name of book	: Haqeeqi Aman Islami Taleemat Ki Roshni Me
Author	: Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V atba
Translator	: Jahirul Hassan Incharge Bangla Desk Qadian
Edition	: 1st Edition (Bengali) December 2023
Copies	: 500
Publisher	: Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian-143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

জলসা সালানা জার্মানি ২০২২-এর
সমাপনী অধিবেশন উপলক্ষ্যে
সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)
কর্তৃক প্রদত্ত
অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, দৃষ্টি-বিকাশক এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা

(২১ শে আগস্ট ২০২২, রবিবার, আইওয়ান ই মাসরূর,
ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্যে প্রদত্ত)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমত ও কৃপা যে পৃথিবীর এ হেন বর্তমান অবস্থা সত্ত্বেও তিনি জামা'ত আহমদীয়া জার্মানিকে তাদের বাৎসরিক জলসা পালন করার সৌভাগ্যদান করেছেন। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর আরো ব্যাপক পরিসরে আপনারা এই জলসা উদ্‌যাপন করছেন। প্রথমে কোভিড মহামারী বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, মহামারীর সমস্যা এখনও শেষ হয়নি, তার উপর এখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আবহ বিশ্বকে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর কোনও অঞ্চলই সম্ভাব্য এই দুর্যোগ থেকে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। **যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এমন ধ্বংস থেকে রক্ষা পাব না।**

প্রাথমিকভাবে, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলি এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বাস করে বসেছিল যে, যুদ্ধের পরিস্থিতি, সংঘর্ষের মতো অবস্থা কিংবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও দেশগুলির ধ্বংসের যে ঘটনাক্রম সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলো আমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আর আমরা সেসব থেকে নিরাপদ। বিপদসংকুল পরিবেশ, বোমা বর্ষণ চলছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, মহিলারা বিধবা আর শিশুরা অনাথ হচ্ছে, মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে- এসব তো এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দরিদ্র দেশগুলিতে ঘটে চলেছে, আমাদের কী যায় আসে এতে? উন্নত দেশগুলি এইসব দেশে তাদের অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে যাতে নিজেদের অস্ত্র-বানিজ্য চলতে পারে, এই ভেবে যে, যদি এই লোকগুলি মারা যায় তবে তা তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে যে এই পরিস্থিতি তাদেরও সাথে ঘটতে পারে। প্রগতির তাড়না তাদের সংবেদনগুলিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাদের অন্ধ করে দিয়েছে। এবং তারপর, **এখন, গোটা বিশ্ব তাই'ই ঘটতে দেখছে যার শঙ্কা ছিল এবং ইউরোপেও এখন যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।**

ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়া ও ন্যাটোর সদস্য দেশগুলি একে অপরের বিরোধিতায় দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন শেষ পর্যন্ত কার কী লাভ হবে বা উভয় পক্ষেরই কতটা ক্ষতি হবে, তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এর পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। এখনও যদি জগৎ ভেবেচিন্তে কাজ না করে, তবে তা সম্পূর্ণ ধ্বংসের

দিকে নিয়ে যাবে। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাইওয়ানের বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছে এবং এটি স্পষ্ট যে সমগ্র বিশ্ব এখন একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। এই যুগে মহান আল্লাহ্ যাকে নিযুক্ত করেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে এ বিষয়ে সতর্কবাণী করেছেন ঃ

"হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, 22তম খণ্ড, পৃঃ 269)

এটাই সেই নির্দেশনা, সাবধান এবং সতর্কবাণী যার কারণে আহমদীয়াতের খলীফাগণ যুগে যুগে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। আমিও অনেক দিন ধরে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বলে আসছি যে, **পৃথিবী যদি এক এবং একমাত্র খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে ধ্বংস অনিবার্য।** অনেকদিন ধরেই আমি বলে আসছি যে ব্লক (ছোট ছোট গোষ্ঠি) তৈরি হচ্ছে এবং এটি শেষ পর্যন্ত একে অপরের ধ্বংসের কারণ হবে, তাই সাবধান। যাইহোক, এসব লোকেরা প্রায়শই এসব কথা শুনে থাকে, আগেও শুনেছে এবং এখনও তাই করে, আর বলে যে সত্যিই পরিস্থিতি ভালো নয়। এটা ঠিক যে এক পর্যায় অবধি সমস্যা রয়েছে তবে তা এতটাও গভীর নয় যেভাবে ভীতিপ্রদ এবং

নিরাশাজনক পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কণ করা হচ্ছে। লোকেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার জামা'তের সদস্যদের কাছেও এটি বলেছে। যাইহোক, **এখন এই সমস্ত লোকেরা, যারা এতদিন বিষয়টিকে হালকা ভাবে দেখে এসেছে, নিজেরাই এখন স্বীকার করতে শুরু করেছে যে পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে। আর এই অচলাবস্থা চলতে থাকলে যে কোনও মুহূর্তে বিধ্বংসী যুদ্ধের পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।**

এখন এসব কথা তাদের থিংক ট্যাংক (think-tank) ও বিশ্লেষকরা সচরাচর বলছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো সমাধান তাদের কাছে নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি কি রূপে সম্ভব, তাদের মনোযোগ যে শান্তির প্রস্রবণের দিকে নেই! তারা জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ধর্মকে অবজ্ঞা করেছে। **যেখানে শান্তির স্থায়ী সমাধান, সেখানে না এসব অমুসলিম সরকার আসতে চায়, আর না দুর্ভাগ্যবশতঃ, মুসলিম সরকারগুলি আসতে ইচ্ছা পোষণ করে!**

এখন কিছু কিছু জায়গায় বিশ্লেষকরা এমনও বলছেন যে, এই যুদ্ধগুলির ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে তা এতটাই বিধ্বংসী হবে যে, একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে বিশ্বের 66 শতাংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমন বিনাশ ও ধ্বংসযজ্ঞ হবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। একজন সাধারণ মানুষ এটা

ভাবতেও পারে না। অতএব, এগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। **এমতাবস্থায় যদি আশার কিরণ থাকে, যদি শান্তির নিশ্চয়তা থাকে, তবে তা একমাত্র সেই সত্তার মধ্যে যাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি শান্তির সম্রাট, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে অন্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়, যাঁর উপর আল্লাহ্র শেষ নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর শিক্ষা হচ্ছে প্রেম ও সম্প্রীতির শিক্ষায় পরিপূর্ণ।**

যিনি সর্বশক্তিমান খোদার সাথে তাঁর আন্তরিক সংযোগের কারণে এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত বিধানকে পৃথিবীতে বিস্তার দেওয়া এবং এ ধরাপৃষ্ঠকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতির অবস্থার প্রতি গভীর উদ্বেগের কারণে নিজের জীবনকে চরম বেদনা ও কষ্টে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। তিনি (সা.) মানুষের জন্য নিজের উদ্বেগের কারণে এমন ব্যথিত হয়েছিলেন এবং যন্ত্রণা ও কাতরতায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বললেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (সূরা শূআরা 26:4) (হে রসূল!) তারা ঈমান (কেন) আনছে না, এই দুঃখে মনে হচ্ছে আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলবেন!

অতএব এই সেই মহান সত্তা যাঁর হৃদয়ে মানবতার জন্য বেদনা ছিল যে, মানুষ যেন তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে যায়

এবং ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সে যেন তার জাগতিকতার সাথে সাথে নিজের আখেরাতকেও সুরক্ষিত করে তোলে। তিনি (সা.) এমন ব্যাপক শিক্ষা তুলে ধরেছেন যার তুলনা অন্য কোনো শিক্ষার সাথে হতে পারে না। এমন শান্তির নিশ্চয়তা তিনি (সা.) প্রদান করেছেন যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত একটি অঙ্গীকার। **দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানরাও এই শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র ঈমানের মৌখিক শ্লোগান দিয়ে একে অপরের রক্ত পিপাসায় মেতেছে এবং এর জন্য বাইরের লোকের সাহায্য চাইছে।**

একজন কলেমা পাঠকারী অপর কলেমা পাঠকারীকে ইসলামবিরোধীদের সাহায্যে হত্যা করছে। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে? এমন অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং এমন বেদনার্ত রসূল (সা.) এর মান্যকারী হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধকে তারা আহ্বান জানাচ্ছে এবং বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার করার পরিবর্তে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরূপে কুখ্যাত হয়ে উঠছে। আর এ সবই এ জন্য যে, শান্তি ও নিরাপত্তার অগ্রদূত এবং মহান খোদার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবক, যাকে খোদা তাআলা এ যুগে শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা পৃথিবীতে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁর কথাও শুনতে রাজি নয়। শুধু যে শুনতে চায় না তাই নয়, বরং তারা (তাদের ঔদ্ধত্যে) এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাঁর (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের উপর কাফের ফতোয়া আরোপের

পাশাপাশি তাদেরকে হত্যা করা ইসলাম ধর্মের সেবা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ভালবাসার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আহ্‌মদীদের জীবন নিয়ে খেলা তাদের দৃষ্টিতে পুরস্কারের যোগ্য। সুতরাং, এই ধরনের লোকেরা কীভাবে ইসলামের শান্তির শিক্ষা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে?

আফশোস! এই লোকেরা যদি বিষয়টি বুঝত! নিকৃষ্ট আলেম হওয়ার পরিবর্তে, তাদের আলেমদের উচিত বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিস্তারকারী আলেম হওয়া যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ্‌ হয়ে বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সঞ্জীবনী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারে এবং তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান সেবকের সাথে একত্রে এ বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছে দিতে পারে। যাইহোক, এটি একটি পৃথক এবং বিস্তারিত নিবন্ধ।

এ সময় আমি মহানবী (সা.)-এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়ত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারের বিষয়ে তাঁর (সা.) নির্দেশনার আলোকে বৈশ্বিক শান্তি নিয়ে আলোচনা করব।

মহানবী (সা.) এর শিক্ষা এবং তাঁর আদর্শ এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক যে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সেগুলির সবিস্তার বর্ণনা সম্ভব নয়। তবে, যেমনটা আমি বলেছি কতিপয় বিষয় এখানে তুলে ধরব।

এটি দাবি করা হয় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,

নাউযুবিল্লাহ্, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননা করে এবং অন্যদেরকেও এরূপ করতে উৎসাহিত করে।

অথচ বাস্তব হল, আমরা মহানবী (সা.) এর শিক্ষা অনুসরণ করি এবং তাঁকে ভালোবাসি। জামা'তীয় সাহিত্যে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। জামা'তের এই স্বর্ণালী নীতিমালা এবং সম্প্রীতির চেতনায় আপ্লুত হয়ে প্রতিবছর সহস্রাধিক পুণ্যচেতা আত্মার শ্রেণী এ বিশ্বজনীন জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছেন। অ-আহ্মদীরাও এটা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, ইসলামের এই শিক্ষাটি এমনই একটি কার্যকরী, ভালবাসাপূর্ণ ও শান্তি প্রসারকারী শিক্ষা যে এটাই আজ বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র সমাধান।

কয়েকদিন পূর্বে, যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় জামা'তের অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং জনমানসে পড়া এ জলসার প্রভাবের ঘটনাগুলির বর্ণনায় আমি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছিলাম, কীভাবে তারা আহমদী সান্নিধ্য এবং জলসার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সন্ধান লাভ করেছিল। যাইহোক, আমাদের বিরোধীরা যা খুশি তাই ভাবতে পারে এবং করতে পারে; আমাদের দায়িত্ব হল, আমরা যদি সত্যিই মহানবী (সা.)-কে ভালবাসি, তবে আমাদের তাঁর শিক্ষার অনুশীলন এবং বিশ্বব্যাপী এর সম্প্রসারণ করা উচিত। বিশ্বকে আমাদের বলা উচিত যে, আজ এ ধরাপৃষ্ঠে শান্তি ও নিরাপত্তার এটাই একমাত্র

সমাধান। তাই আসুন, শান্তি ও সম্প্রীতির কালজয়ী শিক্ষাপ্রদানকারী এই মহান সত্তার সাথে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান অর্জনে ব্রতী হই। এগুলি নিছক দাবি নয়, প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন ইতিহাসের দিকে তাকাই তখন দেখি যে কীভাবে এই মহান নবী (সা.) অশিক্ষিত ও অজ্ঞ আরবদেরকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উচ্চ নৈতিকতা এবং জ্ঞান ও অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম বলেন ঃ

"তিনি সেই নবী (সা.) যিনি বর্বরদের মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন, অতঃপর মানুষকে নৈতিক মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন। অন্য কথায়, তিনি তাদেরকে সত্য ও স্থায়ী নৈতিকতার উচ্চ মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদেরকে সভ্য মানুষ থেকে খোদাওয়ালা মানুষ হয়ে ওঠার ঐশী রঙে আচ্ছন্ন করেছেন।"

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: 183 আল্ইশতাহারু মুস্তায়কিনান বিওহীউল্লাহুল্ কাহ্হার। নাযারত নশর ও এশা'আত কাদিয়ান 2019 হতে প্রকাশিত)

এইভাবে, মহানবী (সা.) তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষনকারীদের তাদের নৈতিকতা এবং ইবাদতের মান অর্জনের বিভিন্ন উপায় শিখিয়েছিলেন, যার ফলে তারা সর্বশক্তিমান খোদার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাদের প্রতিটি কথা ও কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত

হয়েছিল। মানবজাতির অধিকার পূরণও তারা খোদার নৈকট্য অর্জনের অভিপ্রায়ে করেছিল। অতএব, একনিষ্ঠ চিত্তে মহানবী (সা.)-কে অনুসরণ করা একজন ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, সে মহান আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং পরিবর্তে, এই প্রকৃত ভালবাসাই তার প্রতিটি কথা ও কাজকে সর্বশক্তিমান খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়ে পরিণত করে তোলে।

নিষ্কলুষ হৃদয়ে মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান অনুসরণকারীদের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন ঃ

"একনিষ্ঠ চিত্তে মহানবী (সা.)-কে অনুসরণ এবং তাঁর প্রতি অনুরাগ পোষণ মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার স্নেহভাজন করে তোলে।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, 22তম খণ্ড, পৃঃ 67)

এইভাবে, এটি ছিল সেই ঐশী বিপ্লব যা মহানবী (সা.) মানব হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে মূর্তিপূজারীরাও একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠে এবং অবশেষে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার অপত্যস্নেহলাভে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তারা খোদাকে ভালবাসতে শুরু করেছিল এবং খোদাও তাদের প্রতি স্বীয় ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন। এই বিনম্র অনুরাগীরা তাঁর ইবাদতের অধিকারও যথোপযুক্তভাবে আদায় করে। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুশাসনকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে মান্য করে আনুগত্যের সুউচ্চ

মান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে, সে চেষ্টা করে তার প্রিয়জনের প্রতিটি কথা ও কাজ অনুসরণ করার; সে তখন প্রিয়জনের প্রতিটি কথা শোনে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে। শুধু প্রেমের মৌখিক দাবি করে না। এভাবে যখন তাদের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমানুভব জেগে উঠল, তখন তারা তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়েও মনোযোগী হয়ে উঠল এবং মানবাধিকার প্রয়োগে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। আর যখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন তা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক ভালবাসা ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। মানুষ তখন সর্বশক্তিমান খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্যের অধিকার পূরণ করে এবং যখন এই ধরনের মানদণ্ড স্থির করা হয়, তখন শান্তি ও প্রশান্তির ভিত্তিও স্থাপিত হয়। তখন শান্তি প্রতিষ্ঠাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে এবং শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং **মহানবী (সা.) হলেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদেরকে সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সাক্ষাতের পথ দেখিয়েছেন এবং তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁর প্রতি অবতীর্ণ শিক্ষাকে অনুসরণ করলে আমরা পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।**

সবসময় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে শান্তির ভিত্তি সর্বদা পরিবারের মধ্যেই রচিত হয়। অতঃপর, এর পরিধি ক্রমান্বয়ে আপনার প্রতিবেশী, অঞ্চল, শহর, দেশ এবং তারপরে আন্তর্জাতিক

পরিসরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সুতরাং, সর্বস্তরে যখন পরস্পরের আবেগ-অনুভূতি এবং অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া যায়, তখনই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা এই নীতি-শিক্ষাই আমাদের প্রদান করেছেন। প্রত্যেক বর্গের জন্য তাঁর (সা.) এর এই শিক্ষা সমান ভাবে প্রযোজ্য।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই বিষয়টিতে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। তবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে, তিনি এই প্রবন্ধটির শিরোনাম তুলে ধরেছেন ঃ

"মহানবী (সা.) এবং বৈশ্বিক শান্তি"

তাঁর উক্ত নিবন্ধের সুযোগ নিয়ে, আজ আমিও এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব।

আমরা অবগত এবং এটা বুঝি যে শান্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি-সম্প্রীতির অপরিহার্যতার বিষয়ে সবাই কথা বলে। শান্তির পরিস্থিতি একদিকে যেমন একটি পরিবারের সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। মানুষ চায় সর্বাঙ্গীণভাবে প্রতিটি স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, তবে **নিছক আকাঙ্ক্ষা পোষণ শান্তি আনতে পারে না, কারণ এই ক্ষেত্রেও শান্তির আকাঙ্ক্ষা আসলে ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। বিশ্বে আমরা ঠিক**

এটাই দেখে আসছি।

যদি মানুষের কোন স্বার্থপরতা না থাকত, তাহলে যুদ্ধের সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যেত। সাধারণভাবে, যখন কেউ শান্তির কথা বলে, তখন শান্তির আকাঙ্ক্ষা শুধু তার নিজের জন্য হয়ে থাকে। এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যখন একজন ব্যক্তি প্রার্থনা করে বা প্রার্থনা বাদ দিয়েও যখন কেউ মৌখিকভাবে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে বের হয়, আল্লাহ্ আমাকে, আমার স্ত্রী সন্তান এবং নিকটাত্মীয়দেরকে শান্তিতে রাখুন। অন্যদের শান্তিতে থাকার বিষয়ে তার এই আবেগ থাকে না। অথবা, শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য কেউ সম্পদের কামনা করে এবং এটিকে ভাল জিনিস বলে মনে করে, কিন্তু সে সম্পদকে তার শত্রুদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে না, বরং সে কেবল তার নিজের জন্য সম্পদকে কল্যাণের উৎস জ্ঞান করে। একইভাবে যদি সে স্বাস্থ্যকে একটি ভাল জিনিস বলে মনে করে, তবে তার মানে এই নয় যে সে তার শত্রুদের জন্যও সুস্বাস্থ্য কামনা করে; বরং সে চায় তার শত্রুরা দরিদ্র ও দুর্বল হোক, যাতে সে তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। একইভাবে, মানুষ যদি সম্মান এবং আভিজাত্য খোঁজে, তবে তা সবার জন্য না করে শুধুমাত্র নিজের জন্য খোঁজে। তারা কখনই চায় না যে, অন্যরাও একই সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করুক যা তারা পেয়েছে। বিশ্বে সাধারণ জনগণ এবং নেতাদের মধ্যেও আমরা ঠিক এটিই দেখতে পাচ্ছি। রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তারা একে অপরের উপর যে

অবিচার করে যা আমরা আমাদের নিজ দেশে ঘটতে দেখি তা আসলে এইরূপ মন মানসিকতার ফলাফল।

তাই, শুধুমাত্র শান্তির আকাঙ্ক্ষা নৈরাজ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। কেননা যারা তথাকথিত শান্তিকামী তারা কেবল নিজেদের এবং তাদের পরিবার পরিজন অথবা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য এটি কামনা করে। অন্যথায়, তারা অন্যদের এবং তাদের শত্রুদের শান্তি বিনষ্ট করতে চায়। এভাবে যদি নিজের জন্য এক নীতি আর অন্যদের জন্য পৃথ ক-এই দ্বিমুখী নীতির বাস্তবায়ন হয় সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠালাভ করবে তা শুধুমাত্র সীমিত পরিসরে গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে করবে, বিশ্বশান্তি নয়। আর **যদি বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা না হয় তবে তা প্রকৃত শান্তি বলা যেতে পারে না। প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং গোত্রীয়, একই সাথে জাতীয় ও দেশীয় অগ্রাধিকারের ঊর্ধ্বে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে, এবং এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন একজন ব্যক্তি অনুধাবন করবে যে, আমার উপরে একজন মহিমান্বিত সত্তা রয়েছেন যিনি শুধু আমার জন্য শান্তি চান না বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি চান। সেই মহান সত্তা** শুধু আমার পরিবার এবং আমার দেশের জন্য শান্তির প্রত্যাশী নন, বরং তিনি সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চান। সুতরাং, মহানবী (সা.)-এর শান্তির শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুই হল এই উপলব্ধি যে একজন উচ্চতর সত্তা

সর্বদা আমাকে প্রত্যক্ষ করছেন, যার জন্য আমাকে আমার কথা ও কাজকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। সর্বাবস্থায় **উক্ত প্রণালী অনুসরণ করতে হলে আমাদের মহানবী (সা.) নির্দেশিত সুবর্ণ নীতিটি সামনে রাখতে হবে, তা হল, আমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করি তা যেন অন্যের জন্যও পছন্দ করি।**

অতএব, এই নীতিকে সামনে রেখে, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমি যদি কেবল আমার নিজের জন্য বা আমার গোত্রের জন্য বা শুধুমাত্র আমার দেশের জন্য শান্তি চাই, সেক্ষেত্রে আমি মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য, তাঁর সমর্থন এবং সন্তুষ্টি কখনোই অর্জন করতে পারব না।

যখন একজন ব্যক্তি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, একমাত্র তখনই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অন্যথায় নয়। তাই মহান আল্লাহ্‌ মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে আমাদের اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ (আল্‌ হাশর 59:24) তিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শক্তিময় এবং পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা- একথা বলে (অর্থাৎ) اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ বলে মহান আল্লাহ্‌ মানুষের অভিলাষগুলিকে পরিশুদ্ধ করেছেন। এটা নিশ্চিত যে, উদ্দেশ্য সঠিক না হলে কর্ম সঠিক হতে পারে না। যদি কারো উদ্দেশ্যই নিষ্কলুষ না হয়, তাহলে তার কাজে কল্যাণ হবে কি করে? সেক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখতে হবে, নিয়ত শুদ্ধ না হওয়া

পর্যন্ত কোন কাজই কখনও সঠিক হতে পারে না। **আজ পৃথিবীতে যত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা, তার সবই মানুষের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ নয় বলে।**

লোকেরা যা বলে তা তাদের প্রকৃত ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং তাদের কথা ও কাজ তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। বিশ্বের তথাকথিত বৃহৎ ও উন্নত দেশগুলোর এইসব নৈরাজ্যের পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে। যদিও আজ এ বিশ্ব সহিংসতাকে ভুল মনে করে এবং প্রত্যেক নেতার এই বক্তব্য যে যুদ্ধ অন্যায়, তবুও তারা আসলে যা বোঝায় তা শুধু এই যে কেউ যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তা খারাপ, কিন্তু তাদের দ্বারা যুদ্ধের সূচনা হলে, তবে এতে দোষের কিছু নেই। নৈতিকতার এই অবনমনের কারণ হল, তাদের দৃষ্টি সেই সত্তার প্রতি নিবিষ্ট না থাকা যিনি 'সালাম' (শান্তির উৎস) এবং অন্যদেরকে 'সালামতি' (শান্তি) প্রদান করেন। তারা মনে করে, যতদিন আমাদের স্বার্থ থাকবে, আমরা শান্তির স্লোগান দিতে থাকব। তবে, আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু হলে আমরা শান্তি প্রত্যাখ্যান করব। তারা মনে করে, তাদের শত্রুদের অস্ত্র সরবরাহ করার সাহস কারো থাকা উচিত নয়, কিন্তু যদি তারা নিজেরাই তাদের জোটকে অস্ত্র সরবরাহ করে, এমনকি যদি তা অন্যায় কাজেও ব্যবহার করা হয়, তবে তা বৈধ। এই যদি মানসিকতা হয়, তাহলে প্রকৃত শান্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

সুতরাং বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের

এই মৌলিক বিশ্বাসে সংঘবদ্ধ হতে হবে যে এই মহা বিশ্বের একজন খোদা বিদ্যমান যিনি চান যে ধরাপৃষ্ঠে সর্বদা শান্তি বিরাজমান থাকুক। যখন এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠালাভ করবে এবং মানুষ ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে এর উপর কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠবে, একমাত্র তখনই মানবীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবে এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকে তা কল্যাণপ্রদায়ী হয়ে উঠবে। এতে করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি আমাদের মানসিকতা সামগ্রিকভাবে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। তখন আমরা দেখব না যে এটা শুধু আমাদের জন্য লাভজনক কিনা। তখন শুধুমাত্র নিজেদের জন্য কিছু উপকারী কিনা তা বিবেচনা করার পরিবর্তে, আমরা ভাবব যে এটি সমগ্র বিশ্বকে কীভাবে প্রভাবিত করবে। জাগতিক লোকেরা সবসময় নিজেদের স্বার্থে অন্যের শান্তি বিনষ্ট করে এসেছে। যাইহোক, যারা বিশ্বাস করে একজন মহান সত্তা বিদ্যমান রয়েছেন, তারা কখনই এইভাবে (বিরুদ্ধাচরণ) করার সাহস করবে না, কারণ তারা জানে তারা যদি এমনটা করে তবে সেই সর্বোচ্চ সত্তা তাদের উপর স্বীয় ক্রোধ অবতীর্ণ করবেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, **প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব যতক্ষণ না কেউ পরম সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে** এবং নিজ অন্তরে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা জাগিয়ে তোলে। আর **সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই প্রকৃত শান্তি দাতা এই বিশ্বাস শুধুমাত্র ইসলামই উপস্থাপন করেছে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে**। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর প্রতি যে শিক্ষা অবতীর্ণ

করেছিলেন তা হল ঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ۔ يَّهْدِىْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ

(আল্ মায়েদা 5:16-17) 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট হতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্ সেটি দ্বারা সেই সকল লোককে যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন।' এইভাবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হেদায়েতের জ্যোতি প্রেরণ করেছেন, এমন একটি গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন যাতে সমস্ত বিধি-বিধান রয়েছে এবং রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা যা শান্তির দিকে নিয়ে যায়। এমতবস্থায়, যারা ন্যায় নিষ্ঠ হয়ে এটিকে পুরোপুরি মান্য করে চলে তারাই প্রকৃত শান্তিতে থাকবে। এটা স্পষ্ট যে, মুসলমানরা আজ যেভাবে বিশৃঙ্খলা, কলহ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত, তার কারণ হল, তারা মহান আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাব ও ঐশী জ্যোতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করছে না। যদিও তারা দাবি করে যে তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অনুগত, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড এর বিপরীত। আল্লাহ্‌র বাণী চিরন্তনী কখনো ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ হতে পারে না, যেভাবে মহানবী (সা.) এর বাণী কখনো ভ্রান্তিমূলক হতে পারে না।

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের প্রধান কারণ হল, তারা এই সুস্পষ্ট কিতাবকে অনুসরণ করার মৌখিক দাবি তো করে, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তাআলা এর মধ্যে যে বিধি-

নিষেধ নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করে না। তারা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসে বলে দাবি করে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও মতাদর্শের ওপর আমল করতে কার্যত ব্যর্থ হয়।

তাই আজ মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবকের একনিষ্ঠ মান্যকারীদের দায়িত্ব হচ্ছে এই শিক্ষাগুলিকে নিজেদের জীবনের অঙ্গ বানিয়ে নেওয়া এবং কুরআন করীমের অনুশাসনগুলির ওপর আন্তরিক আমল করা। এর মাধ্যমেই আপনি আপনার চারপাশে শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবেন এবং এই শান্তির বার্তা বিশ্বে বিস্তার করতে পারবেন। অন্যথায়, বিশ্ব বলবে আমাদের উপদেশ দেওয়ার আগে আপনি আপনার কথা ও কাজ এক করুন। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম বলেন ঃ

"এখন আসমানের নীচে কেবলমাত্র একজনই নবী আছেন এবং মাত্র একটিই কিতাব রয়েছে; অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- যিনি সকল নবীগণের থেকে উত্তম ও মহান এবং সকল রসূলগণের চাইতে অধিকতর নিখুঁত ও পরিপূর্ণ এবং যিনি নবীগণের মোহর এবং সমস্ত মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে সর্বশক্তিমান খোদাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে এবং এই জগতেই প্রকৃত মুক্তিলাভের লক্ষণাবলী ও প্রভাব প্রকাশিত হয় এবং কুরআন শরীফ- যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইল্ম ও মারেফাত বা প্রকৃত জ্ঞান এবং খোদার

উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায় এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতাসমূহ থেকে মুক্ত হয় এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের যাবতীয় আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ লাভ করে এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত হয়"। - (বারাহীনে আহ্মদীয়া, চতুর্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, পৃ: 557-558,পাদটীকা)

এইভাবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর দ্যুতিময় নূর মহানবী (সা.) এবং কুরআন করিম- যা একটি জ্যোতির্ময় গ্রন্থ এবং সর্বপ্রকার প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণস্থল এবং পথনির্দেশনার দীপশিখা এবং শান্তির অভয় বাণী- তা প্রেরণের মাধ্যমে মানবজাতির উপর একটি মহা অনুগ্রহ দান করেছেন। মানুষ যদি এর সদ্ব্যবহার না করে এবং নিজেদের ধ্বংসাত্মক স্বার্থান্বেষী স্বার্থে বন্দী থাকে, তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

কেউ যদি ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সুশোভিত করতে চায়, যদি কেউ শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়, তবে তাকে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই বাণীগুলিকে সামনে রাখতে হবে : يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ (সূরা আল্ মায়েদা 5:17) (অর্থ- এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।) সর্বদা শাশ্বত এই দীপ্যমান গ্রন্থের দিকনির্দেশনাগুলি আপনার সামনে রাখুন। এই ঐশী গ্রন্থের অনুশাসনগুলি পাঠ করতে এবং

এগুলিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, তবেই আমরা শান্তি এবং নিরাপত্তার পথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। এই গ্রন্থে এমন কোনো আদেশ নেই যা মানবীয় শান্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই **আজ এই বার্তাটি মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে আমাদের একমাত্র কর্তব্য এবং এটিই হবে বিশ্ব শান্তির গ্যারান্টি।**

সুতরাং, এই ছিল সেই ঐশী বিপ্লব যা মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবাগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। আর এমন জামা'ত তৈরী করে দিয়েছিলেন যারা বাহ্যত وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (সূরা ফুরকান 25:64) 'আর যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম''- এর সত্যায়নকারীতে পরিণত হয়েছিল। আমাদের মধ্যেও যদি অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় আর বিশ্বের মধ্যেও যদি আমরা এমনটি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই সুরক্ষিত হবে।

অতএব, **হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের মান্যকারীদের উপর অর্পিত এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব, যাদেরকে আপন পরিবারে, সমাজে এবং বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।** আর এটা তখনই সম্ভব যখন আমাদের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে এবং আমরা বিশ্বকে এই প্রকৃত একত্ববাদের দিকে আমন্ত্রণ জানাব।

নিঃসন্দেহে, খোদার একত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ব্যতীত

কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আমি ইতিমধ্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি যে, যেভাবেই হোক, একজনকে অবশ্যই পরম সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সেই পরম সত্তা হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ স্বয়ং এবং তাঁর ধারণা হৃদয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ছাড়া আসতে পারে না। আর চিরঞ্জীব খোদার সার্বভৌমিকতায় যদি বিশ্বাস তৈরী না হয়, সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ চলতেই থাকবে। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব; পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-সম্প্রীতি গড়ে উঠলে তবেই বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটবে। **মানুষের মধ্যে সত্যিকারের সম্প্রীতি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং প্রকৃত সম্প্রীতি এক খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কস্থাপন ছাড়া সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব**। এটি কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি নয়, বরং একজনকে তাঁর সাথে ব্যাক্তিগত সংযোগও স্থাপন করতে হবে। আর এই সুমহান শিক্ষা আমরা অর্জন করেছি মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে।

তাই, যখন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পবিত্র কুরআনে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সূরা ফাতিহা 1:2) শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের প্রত্যেক নামাযে এটি পাঠ করার নির্দেশনাও প্রদান করেছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের উদার চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করার মাধ্যমে, সর্বশক্তিমান খোদার প্রভুত্বের উপলব্ধি সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়। এই কথাগুলো পাঠ করে একজন ব্যক্তির চিন্তার সম্প্রসারণ ঘটে এবং সে খোদা তাআলার গুণকীর্তন করে,

যিনি সকল বিশ্বজগতের প্রভু। তিনি খ্রিস্টানদের প্রভু, হিন্দুদের প্রভু, ইহুদীদের প্রভু এবং সকল মানবাত্মার প্রভু। যখন একজন মানুষ এই শব্দগুলি পড়ে, তখন কারও প্রতি অসহিষ্ণু কীভাবে হতে পারে? আমি একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে একটি অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম। তাদের অনেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন যে এই বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা এমন যে একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনও তাদের অন্তরে অন্যের প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করতেই পারে না। رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সকল জগতের প্রভু) বাক্যটি প্রত্যেককে আবৃত করেছে এবং এটি শান্তি ও সম্প্রীতির বিস্তারের জন্য সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত পথ উন্মুক্ত করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক) এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, **যদি সত্যিকারের তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের জিহ্বা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে, তাহলে কোনো জাতির পক্ষেই অন্তরে বিদ্বেষ থাকা সম্ভব নয়, তা খ্রিস্টান, হিন্দু বা ইহুদীর বিরুদ্ধেই হোক না কেন।**

এটা কীভাবে হতে পারে যে একদিকে সে তাদেরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, আবার একইসাথে তাদেরকে দেখে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণাও করে। এটা হতে পারে না। সুতরাং, যিনি সত্যিকারের খোদার একত্বে বিশ্বাসী তিনিই শান্তি ও সম্প্রীতির প্রকৃত পতাকাবাহী। মুসলমানরা যদি প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তাদের জীবনকে পরিচালিত

করে, তাহলে তারাই হয়ে উঠবে পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তিপ্রিয়। কিন্তু তারপরও একই কথা প্রযোজ্য যে, এর জন্য **মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবকের সাথে সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন, তবেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঠিক উপলব্ধি হতে পারে।**

কিন্তু একই সময়ে, আমি আবারও বলব যে, এটি আমাদের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পাশাপাশি আমাদের উপর একটি বড় দায়িত্বও ন্যস্ত করে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণ হিসাবে 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করি এবং আমাদের অন্তর এর গভীর অর্থ অনুধাবন করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। যদি কারো হৃদয় ও মন এর গভীর সারবত্তা বর্জিত হয়, তাহলে আমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা বিশৃঙ্খলা ও কলহ সৃষ্টি করে এবং আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব না যারা শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটায় এবং মহানবী (সা.) এর আনিত শিক্ষার উপর ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে আমল করে।

সুতরাং, বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা এবং বিবেচনা করা উচিত। উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আজ, প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য একমাত্র খোদার প্রতি তার ঈমানকে শক্তিশালী করে তোলা। তাদের হৃদয়ে খোদার ভালবাসা স্থাপিত হোক যাতে অন্য কোন ভালবাসা তাঁর স্থান নিতে না পারে। তাঁর নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করার জন্য, মহানবী (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ শিক্ষাকে,

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনকে আপনার জীবনের একটি অংশ করে নিন। আমাদের মান যখন এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আদেশ এবং মহানবী (সা.) এর প্রতিটি বাণী আমাদের কথা ও কাজের অংশ হয়ে উঠবে, তখনই আমরা বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। সেক্ষেত্রে আমরা কেবল প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব না, আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমেও তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলব এবং প্রকৃতপক্ষে এটিই সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং প্রমাণ করতে পারি যে মহানবী (সা.) হলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণার একমাত্র উৎস। আর এটাই হল সেই উপায় যার মাধ্যমে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীদের নীরব করতে পারি।

যাইহোক, **আজ এই কাজটি প্রতিশ্রুত মসীহের জামা'তের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমরাও যদি দেশীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সে অনুযায়ী আমাদের ভূমিকা পালন না করি, তাহলে আমরা যে শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করতে পারব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।** আমাদের প্রজন্মের শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, আর না বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা রয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের এ বিশ্বকে অমানিশার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ তাআলা

আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

আমরা এখন সমবেত দোয়া করব।

দোয়ার মধ্যে সকলের এটিও দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জলসার বরকত দান করুন এবং প্রত্যেককে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করে তুলুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টি হোক যাতে আমরা সকল প্রকার উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ পরিসরে এবং একই মহিমায় আমাদের জলসাগুলি করতে পারি এবং জলসাগুলিকে আমাদের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে যেন আমরা আমাদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হই। আমরা যেন আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও অনুগ্রহের প্রাপক হয়ে উঠতে পারি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তৌফিক দান করুন।

অনুগ্রহ করে এখন আমার সাথে দোয়ায় শামিল হোন।

দোয়ার পরে হুযূর আনোয়ার বলেন ঃ প্রথমে জলসায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান শুনুন তারপর 'নারা' (ধ্বনি) দিতে পারেন। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জলসায় মোট উপস্থিতি ১৯,৭৮২, যার মধ্যে ৯,৪৮২ জন মহিলা এবং ১০,৩০০ জন পুরুষ। এ ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ জলসা সালানার কার্যক্রম দেখছেন

বা শুনছেন। এবার আপনারা পরবর্তী কর্মসূচী শুরু করুন।

(আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল 27 ডিসেম্বর 2022, পৃঃ 6-10)

.....